ভূমিকা

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রথম প্রধানতম কলঙ্ক। প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পদমর্য্যাদায় নন্দকুমার তৎকালে দেশের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। বাংলার নবাব এবং দিল্লীর বাদশাহ উভয় কর্ত্তৃকই তিনি "মহারাজ" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। দেশের লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশা লাঘবের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের ঘুষখোর অর্থপিশাচ ও অত্যাচারী শাসকদের অনাচারের প্রতিবাদ করিয়াই তিনি তাহাদের রোষ-দৃষ্টিতে পড়েন।

এই হত্যা ব্যাপারের প্রধান নায়ক ছিলেন ভারতের প্রধান বড়লাট ওয়ারেণ হেষ্টিংস্। মহারাজের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ করা হইয়াছিল। বিচারক ও জুরীরা সকলেই ছিলেন হেষ্টিংসের স্বজাতি ও স্বগোত্রীয়। বিচারকের আসনে বসিয়া বিচারের নাম করিয়া এত বড় প্রহসন ইতিপূর্ব্বে বাংলা দেশে আর হয় নাই। এই জালিয়াতদের শয়তানিতে অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী মহারাজ নন্দকুমারের মৃত্যুর বিষাদময় স্মৃতি দেশবাসীর হৃদয়ে চির-জাগরূক রহিবে।

এক

মহারাজ নন্দকুমার বাঙ্গালী। ইহারা ব্রাহ্মণ। নন্দকুমারের জন্মস্থান ভদ্রপুর।

তখন ভদ্রপুর ছিল মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত, এখন পড়েছে বীরভূম জেলায়। ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে নন্দকুমারের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম পদ্মনাভ।

পদ্মনাভ আলিবর্দ্দী খাঁ, মুর্শিদকুলী খাঁ প্রভৃতি বাংলার নবাবদের অধীনে তহশীলদারের কাজ করতেন। তিনি একজন বেশ বুদ্ধিমান্ বৈষয়িক লোক ছিলেন, কাজেই চাকরিতে সুনাম সুখ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে মা-লক্ষ্মীও তাঁর প্রতি যথেষ্ট কৃপাবর্ষণ করেন।

নন্দকুমার বাল্যকাল থেকেই ছিলেন বেশ বুদ্ধিমান্ ও তেজস্বী। কোনো একটা কাজ করতে আরম্ভ করলে শেষ না

ক'রে তিনি তা ছাড়তেন না,—যত বারই তিনি ব্যর্থ হতেন, ততই তাঁর জেদ বাড়তে থাকতো কাজটি সুসম্পন্ন করবার জন্য। ছোটবেলা থেকেই তাঁর স্বভাব ছিল কর্ত্তৃত্ব করা। কারো অধীনতা সহ্য করবার মত স্বভাব নিয়ে তিনি যে পৃথিবীতে আসেন নি, এ ভাবটা তাঁর বাল্যজীবনের প্রতি কার্য্যে প্রমাণ পাওয়া যেতো।

খেলার সময় নন্দকুমারই হ'তেন দলের সর্দ্দার। বালকেরা তাঁর আদেশ এক তিলও অমান্য করতে সাহস করতো না। দলের মধ্যে ঝগড়া বাধলে নন্দকুমার হ'তেন তার বিচারক। তাঁর বিচারের ফল উভয় পক্ষই নতশিরে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিত। আবার কারও উপর প্রতিশোধ নিতে হ'লে তাও নন্দকুমারের সাহায্য ছাড়া হ'তো না। এমনি করেই বাল্যকাল থেকে সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করবার এবং বড় হবার ইচ্ছা নন্দকুমারের শিশু-হৃদয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে জেগে উঠছিল।

নন্দকুমার বুদ্ধিমান্ ও মেধাবী ছেলে ছিলেন ; কাজেই, লেখাপড়াতেও কারো অপেক্ষা তিনি হীন ছিলেন না। গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় তখনকার প্রচলিত রীতি অনুসারে নন্দকুমারের প্রথম বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। সেখানে অঙ্ক ও বাংলা ভাষা বেশ ভাল ক'রে শিখে তিনি মুন্সী ও মৌলবীদের কাছে পার্শী শিখতে আরম্ভ করেন। তখন ছিল মুসলমানদের আমল, কাজেই পার্শী না শিখলে কোনো চাকরী পাওয়া

যেত না। নন্দকুমার পার্শী ভাষাটা এত সুন্দর শিখেছিলেন যে, অনেক শিক্ষিত মুন্সী ও মৌলবীর চেয়ে তিনি সুন্দর শুদ্ধ ভাষায় কথা বল্‌তে ও লিখ্‌তে পারতেন।

তাঁর হাতের লেখা ছিল ভারী সুন্দর। পার্শী ভাষায় কোনও কিছু মুসাবিদা বা দরখাস্ত করতে হ'লে লোকে তা' নন্দকুমারকে দিয়ে লিখিয়ে নিত। ব্রাহ্মণের ছেলে তিনি, কাজেই, সংস্কৃত শেখা তাঁর একান্ত দরকার। গ্রামের টোলে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং দর্শন পড়েন।

শুধু লেখাপড়া শিখে একজন বড় পণ্ডিত হ'লেই সংসারের শিক্ষা শেষ হয় না। সংসারে চল্‌তে হ'লে নানা বিষয় শিক্ষা লাভ করতে হয়। সংসারের চারিদিকে নানা ঘটনা দেখেশুনে, বহু লোকের সঙ্গে মিশে, নানা বিষয়ের বই পড়ে এবং হাতে-কলমে অনেক কাজ ক'রে তবে শিক্ষা লাভ করতে হয়। পিতা পদ্মনাভ এইবার পুত্রকে চাকরীর উপযুক্ত কাজকর্ম্ম শিখাবার জন্য নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। নন্দকুমার পিতার কাছে থেকে জমিদারীর কাজকর্ম্ম মনোযোগের সহিত শিখতে লাগলেন। বুদ্ধিমান্ বালক অল্পদিনের মধ্যেই সব শিখে ফেল্লেন। পদ্মনাভ এইবার তাঁকে তাঁর অধীনে ঘোড়াঘাট, ফতেসিং ও সাতসইকা এই তিনটি পরগণার নায়েব ক'রে দিলেন।

বয়সে নবীন হ'লেও নন্দকুমার বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে কাজ

করতে লাগলেন। কি উপরস্থ কি নীচস্থ সকল কর্ম্মচারীই নন্দকুমারের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ব্যবহারে পরম পরিতুষ্ট হ'লেন। অল্প দিনের মধ্যেই নন্দকুমারের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

পদ্মনাভ এইবার পুত্রের বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্রীর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কত বড় বড় ঘরের সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ এলো। পদ্মনাভ একে একে সমস্ত পাত্রীই দেখলেন, কিন্তু কোনোটিই তাঁর মনের মতন হ'লো না! অবশেষে এক গরীব ব্রাহ্মণের এক সুন্দরী সুলক্ষণা কন্যা দেখে তাঁর পছন্দ হ'লো। এঁর নাম ক্ষেমঙ্করী দেবী।

নন্দকুমার পদ্মনাভের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাই পদ্মনাভ বিয়েতে খুব ঘটা করলেন; যথেষ্ট টাকা-পয়সা খরচ হ'লো। বউ দেখে সবাই শতমুখে তাঁর প্রসংসা করতে লাগলো। সত্যই মহারাণী ক্ষেমঙ্করী যেমন সুন্দরী, তেমনি দয়াবতী ও গুণবতী ছিলেন। এখনো সে অঞ্চলে মহারাণী ক্ষেমঙ্করীর দয়া এবং গুণের কথা শুনতে পাওয়া যায়।

দুই

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ বাংলার নবাব সরফরাজ খাঁকে অন্যায় যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে এবং হত্যা করে মুর্শিদাবাদের নবাবী গদীতে বস্‌লেন।
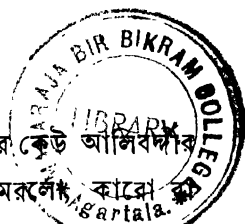
যারা সরফরাজের পক্ষ নিয়েছিল, তাদের কেউ আলিবর্দ্দীর দলের লোকের হাতে বন্দী হ'লো, কেউ বা মরলো, কারো বা চাকরী গেল। এই সময় হিজলী ও মহিষাদলের নায়েবের পদ খালি হওয়ায় নন্দকুমার ঐ চাকরীতে বহাল হ'য়ে হিজলীতে গেলেন।

নন্দকুমারের এই নূতন চাকরীর কিছুদিন একরকম বেশ কেটে গেল। কিন্তু তার পরেই বাংলা দেশে একটা ভীষণ গোলমাল আরম্ভ হ'লো। এই গোলমালের নাম "বর্গীর হাঙ্গামা।"

মহারাষ্ট্র দেশ থেকে মারহাট্টা অশ্বারোহীরা এক এক সময় দলে দলে এদেশে এসে গরীব দেশবাসীর যথাসর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে যেতো। এই মারহাট্টাদের বলতো "বর্গী"। তাদের অত্যাচারে দেশে একটা ভীষণ হাহাকার উঠে ছিল। দু'এক বছর নয় ক্রমান্বয়ে দশ-বারোটি বছর ধ'রে বর্গীরা বাংলা দেশে লুটপাট ক'রে বেড়িয়েছিলো। 'খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো, বর্গী এলো দেশে'—এই ঘুমপাড়ানো ছড়াটার সৃষ্টি হ'য়েছিল সেই সময়।

এই বর্গীদের দমন করতে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁকে বহু বছর ধরে অনাহারে অনিদ্রায় অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে কাটাতে হ'য়েছিল এবং তাতে টাকা খরচও হ'য়েছিল অনেক। রাজকোষ প্রায় শূন্য হ'য়ে গেল। অথচ বর্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হ'লে টাকা

চাই ঢের। তখন আলিবর্দ্দী প্রজাদের উপর নূতন ক'রে খাজনা বসালেন। একেই প্রজারা বর্গীর অত্যাচারের ফলে পেট ভ'রে খেতে পাচ্ছিল না, তার উপর আবার এই নূতন খাজনার চাপ তাদের উপর পড়ায় তারা অস্থির হ'য়ে পড়লো।

হিজলীর নায়েব নন্দকুমারের উপরেও কড়ায় গণ্ডায় খাজনা আদায় ক'রে মুর্শিদাবাদে পাঠাবার হুকুম হলো। কিন্তু নন্দকুমারের প্রাণ ছিল কোমল, প্রজারা একেই খেতে পায় না, তার ওপর আবার জোর-জুলুম করে তাদের কাছ থেকে বেশী করে খাজনা আদায় করতে নন্দকুমারের প্রাণে বড় ব্যথা লাগলো। তিনি নবাবের হুকুম তামিল করতে পারলেন না। তাঁর মহলে প্রজাদের কাছে আশী হাজার টাকা বাকী পড়লো।

এই খাজনা অনাদায়ের অপরাধে নবারের ফৌজ গিয়ে নন্দকুমাকে বন্দী করে রাজধানী মুর্শিদাবাদে নিয়ে এলো। আশী হাজার টাকা দিতে না পারলে তাঁর মুক্তি নাই। শুধু কি তাই? টাকা না দেওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ সকালে তাঁকে নবাব দরবারে হাজির করে বেত মারার হুকুম হলো! পদ্মনাভ ছেলের বিপদের কথা শুনে সব টাকা শোধ করে দিলেন।

নন্দকুমারের চাকরী গেল।........

নন্দকুমার নানা জায়গায় ঘুরে আবার চাকরীর চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও বিশেষ কিছু সুবিধা হলো না। কিছুদিন পরে মুর্শিদাবাদ নবাব-সরকারেই আবার তাঁর চাকরী

হ'লো। কিন্তু যেখানে একদিন তিনি অপমানিত হয়েছিলেন সেখানেই আবার চাকরী করা তাঁর ভাল লাগলো না। কাজেই তিনি সে চাকরী ছেড়ে দিয়ে হুগলীতে চলে গেলেন। হুগলী তখন একটা বড় বন্দর। নানা দেশ-বিদেশের বণিকেরা তখন সেখানে বাণিজ্য করতে আসতো।

তিন

হুগলীতে এসে নন্দকুমার আবার এক নূতন বিপদে পড়লেন। কোন বিশেষ কারণে সেখানকার মুসলমান কর্ম্মচারী মীর হিদাতুল্লা তাঁকে বন্দী করেন। কিছুদিন বন্দী থেকে নন্দকুমার মুক্তিলাভের পর মুর্শিদাবাদে চলে আসেন। এমনি করে নন্দকুমারকে একবার মুর্শিদাবাদে ও একবার হুগলীতে যাতায়াত করতে হয়েছিল এবং দুঃখ-কষ্ট পেতে হয়েছিল যথেষ্ট।

এইবার নন্দকুমারের দুঃখের মেঘ কেটে গেল। তিনি মুন্সী সাদেকউল্লার সাহায্যে হুগলীর ফৌজদার মোহম্মদ ইয়ার বেগের দেওয়ানী পদ পেলেন। তখন হুগলীর ফৌজদারের ক্ষমতা ছিল যথেষ্ট। সমস্ত ফৌজদারের চাইতে নবাবের নিকট হুগলীর ফৌজদারের সম্মানই ছিল বেশী। তিনিই ছিলেন হুগলী, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি স্থানের সর্ব্বেসর্ব্বা অর্থাৎ দ্বিতীয় নবাব। তিনি

যা ইচ্ছা তাই করতে পারতেন। দেশের শাসন, খাজনা আদায়, সৈন্য-সামন্ত সবই ছিল ফৌজদারের হাতে। ইংরাজ, ফরাসী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি বণিকেরা সব সময় নিজ নিজ সুবিধা করে নেবার জন্য এসে ফৌজদারের কাছে হাতজোড় করে দাঁড়াতো।

ফৌজদারের নীচেই ছিলেন দেওয়ান। ফৌজদারের কাছে কোন দরবার করতে হলে লোকের আগে যেতে হতো দেওয়ানের কাছে। দেওয়ানকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই সব হ'তো। তাই হুগলীর ফৌজদারের দেওয়ান হ'য়ে নন্দকুমারের সম্মান ও ক্ষমতা খুব বেড়ে গেল। এই সময় থেকে নন্দকুমার 'দেওয়ান নন্দকুমার' নামে পরিচিত হলেন।

কলকাতাতেও ইংরাজদের একটা বড় কুঠী ছিল। এইখান থেকে তারা চারদিকে বাণিজ্য করতো।

হুগলীর ফৌজদারকে কলকাতার উপরেও নজর রাখতে হ'তো। ইংরাজ বণিক্‌দের কোনো বন্দোবস্ত বা কিছু করতে হলে হুগলীর ফৌজদারের কাছেই করতে হ'তো। কখনো কিছু গোলমাল বাধ্‌লে হুগলীর ফৌজদারই তা মীমাংসা করে দিতেন। কলকাতার কুঠীর ইংরাজেরা অনেক সময় অন্যায় রকম বাণিজ্য করতো, এইজন্য হুগলীর ফৌজদারকে তাদের উপর কড়া নজর রাখতে হ'তো। এই ব্যাপার নিয়ে দেওয়ান নন্দকুমারের সঙ্গে কলকাতার কুঠীর ইংরাজদের বিশেষ পরিচয় ঘটে।

নন্দকুমারের কিছুদিন দেওয়ানী করার পর ফৌজদার ইয়ার বেগের চাকরী গেল। তাঁর জায়গায় আর একজন নূতন ফৌজদার নিযুক্ত হ'লেন। নূতন ফৌজদার তাঁর পছন্দমত লোককে দেওয়ান করলেন। কাজেই, নন্দকুমারের চাকরী গেল। তিনি মুর্শিদাবাদে এসে আবার নূতন চাকরীর চেষ্টা করতে লাগলেন।

এই সময় বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দীর মৃত্যু হ'লো। বাংলার শূন্য মস্‌নদে বসবেন তখন তাঁর দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা। অন্যান্য দৌহিত্রের মধ্যে সিরাজই ছিলেন আলিবর্দ্দীর অধিকতর প্রিয়পাত্র।

মৃত্যুসময়ে বিচক্ষণ ও দূরদর্শী আলিবর্দ্দী সিরাজকে উপদেশ দিয়ে গেলেন,—"ভাই সিরাজ, আমার মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসন তোমার। কিন্তু আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, সিংহাসনের চারিদিকে বহু শত্রু গজিয়ে উঠ্‌ছে। আমার অভাবে তোমায় নিতান্ত বালক দেখে তারা নানা রকম ষড়্‌যন্ত্র আরম্ভ করবে। সেই ষড়্‌যন্ত্রে বাংলার মস্‌নদ, এমনকি, তোমার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হ'তে পারে। সিংহাসন রক্ষা করতে হ'লে গোড়া থেকেই তোমায় সাবধান হ'তে হবে। তা' না হ'লে জীবন এবং রাজ্য রক্ষা করতে পারবে না। শত্রুদের মধ্যে ইংরাজ সদাগরেরাই দিন দিন বেড়ে উঠ্‌ছে। তাদের উদ্দেশ্য ভাল নয়, সদাগরী ছেড়ে এখন তারা চায় দেশের রাজদণ্ড ধারণ করতে। তোমার

কর্ত্তব্য হচ্ছে, আগে তাদের দমন করা। যদি তা পার, তবে তোমার রাজ্য ও জীবন হবে নিষ্কণ্টক।—দেশে তাদের কোনও সৈন্য রাখতে বা দুর্গ গড়্‌তে দিও না,—যদি দাও, এদেশ আর তোমার থাকবে না। তাদের ওপর কড়া নজর রাখবে, যেন তারা মাথা তুলতে না পারে। খোদার দরবার থেকে ডাক না এলে আমিই তার ব্যবস্থা করতাম,—কিন্তু পারলাম না, ভাই।"

সিরাজ নবাব হ'য়ে দাদা মহাশয়ের উপদেশমত কাজ করতে চেষ্ট করেছিলেন। কিন্তু দেশের কতকগুলো দুষ্ট লোকের শত্রুতায় তাঁর সে চেষ্টা সফল হ'তে পারে নি।

চার

সিরাজ সিংহাসনে ব'সে দু' একদিন পরেই ইংরেজদের কলকাতায় তখন যে নূতন দুর্গ তৈরী হচ্ছিল তা' ভেঙ্গে ফেলতে এক পরোয়ানা পাঠিয়ে দিলেন।

ইংরেজরা সেই পরোয়ানা পেয়ে উত্তর দিলে—"আমাদের কোনো নূতন দুর্গ তৈরী হচ্ছেনা, পুরাতন দুর্গটাই মেরামত হচ্ছে মাত্র।"

এই মিথ্যা চিঠি পেয়ে সিরাজ তেলে-বেগুনে জলে উঠ্‌লেন। তখনি নবাবের ফৌজ কলকাতার ইংরেজদের দুর্গ ভেঙ্গে ফেলতে

ছুট্‌লো। যুদ্ধে ইংরাজেরা হেরে কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে গেল।

এই সময় হুগলীর ফৌজদারের চাকরী গেল। নন্দকুমার অনেক দিন হুগলীতে ছিলেন এবং তিনি ইংরেজদের বিষয় ভাল-ভাবে জানেন ব'লে সিরাজ এইবার তাঁকেই হুগলীর ফৌজদারী দিলেন। দেওয়ান মাণিকচাঁদ এবং নন্দকুমার এই দু'জনের উপর ইংরেজদের প্রতি কড়া নজর রাখবার ভার পড়লো।

নন্দকুমার ফৌজদারী পেয়ে তাঁর কর্ত্তব্য কড়ায়-গণ্ডায় পালন করতে লাগলেন। তিনি অনেক দিন ইংরেজদের সঙ্গে থেকে তাদের স্বভাব-চরিত্র ভালভাবেই জেনেছিলেন। ইংরেজেরা পরাস্ত হ'য়ে কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে গেলেও নন্দকুমার নিশ্চিন্ত হ'তে পারলেন না। তিনি মনে করলেন, তাঁরা যে-কোন সময় সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এসে আবার উপস্থিত হ'তে পারে। তাই তিনি তাদের হাত থেকে কলকাতা রক্ষা করবার জন্য নানা ভাবে আয়োজন করতে লাগলেন। বজবজের দুর্গ মেরামত ক'রে সেখানে সৈন্য, রসদ ও গোলা-বারুদ রাখা হ'লো। কলকাতার দক্ষিণ দিকে গঙ্গা দিয়ে ইংরেজরা আবার না আসতে পারে, এই জন্যে নন্দকুমার এক তীরে'আলিগড়' এবং অপর তীরে 'তালা' নামে একটি দুর্গ তৈরী করালেন। এই দুর্গের মাঝখানে গঙ্গার চওড়া বেশী নয়, নন্দকুমার মনে করলেন, ঐ জায়গাটা ইট দিয়ে বুজিয়ে দেবেন। তাহ'লে ইংরেজরা আর

তাদের যুদ্ধ-জাহাজ নিয়ে আসতে পারবে না। নন্দকুমার দু'খানা জাহাজ কিনে তাতে ইট বোঝাই করতে হুকুম দিলেন।

যে ইংরেজরা কলকাতার যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল, তারা কলকাতা ছেড়ে ফল্‌তায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। মাদ্রাজে তাদের আরও বাণিজ্যের কুঠী ছিল। সেখানেও সৈন্য থাকতো। মাদ্রাজ থেকে সৈন্য আসবার আশায় এখানকার ইংরেজরা চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

সিরাজ দেওয়ান মাণিকচাঁদের উপর কলকাতা রক্ষার ভার দিয়েছিলেন, কিন্তু মাণিকচাঁদ গোপনে গোপনে ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন।

এর মধ্যে হঠাৎ মাদ্রাজ থেকে ইংরেজ সৈন্য এসে হাজির হ'লো। ফল্‌তার ইংরেজরা মাদ্রাজের ইংরেজদের সঙ্গে মিশে বজবজ দুর্গ আক্রমণ করতে চললো। মাণিকচাঁদ নবাবের চাকর, তাই তিনি প্রকাশ্যে ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিতে পারলেন না। শুধু লোক-দেখাবার মত কতকগুলো সৈন্য নিয়ে কলকাতা থেকে তিনি বজবজ দুর্গ রক্ষা করতে চললেন।

যুদ্ধে জয়লাভ মাণিকচাঁদের ইচ্ছা নয়, ইংরেজ জিতুক এই তার আন্তরিক ইচ্ছা; কাজেই, তিনি তেমন মন দিয়ে যুদ্ধ করলেন না, ফলে ইংরেজরা বজবজ দুর্গ দখল ক'রে বসলো। মাণিকচাঁদ হেরে গেলেন এই ভাণ ক'রে একেবারে মুর্শিদাবাদে গিয়ে হাজির।

কলকাতায় তখন নবাব সৈন্য ছিল বটে, কিন্তু তাদের পরি-চালন করবার লোক তখন সেখানে কেউ ছিল না। দেওয়ান মাণিকচাঁদ তখন মুর্শিদাবাদে। নবাব সৈন্যেরা যতটা সাধ্য গোলাগুলি ছুঁড়ে যুদ্ধ করলো, কিন্তু জিততে পারলো না। ইংরেজরা আবার কলকাতা দখল ক'রে বসলো।

ইংরেজরা কলকাতা দখল করলো বটে, কিন্তু তাদের ভয় রইলো হুগলীর জন্য। কারণ, তারা জানতো যে, হুগলীতে অনেক নবাব-সৈন্য মজুত থাকে। হুগলী দখল করতে না পারলে তাদের আশা-ভরসা সমস্তই নষ্ট হয়ে যাবে, হয়ত আবার কলকাতা ছেড়েও যেতে হ'তে পারে। তাই তারা কয়েকখানা যুদ্ধ-জাহাজ নিয়ে তাড়াতাড়ি হুগলী দখল করতে যাত্রা করলো।

সে সময় নন্দকুমার তাঁর সৈন্যদের হুগলী থেকে একটু দূরে রেখে দিয়েছিলেন। ইংরেজরা হুগলী দুর্গ দখল ক'রে ব্যাণ্ডেলের ধানের গোলা লুঠ করতে যায়। এইখানে নন্দকুমারের সৈন্যেরা ইংরেজদের ঘিরে তাড়া করে। তাড়া খেয়ে ইংরেজরা পালিয়ে নৌকায় উঠে কলকাতায় চ'লে আসে।

সিরাজ ইংরেজদের কলকাতা অধিকার এবং হুগলী ও ব্যাণ্ডেল আক্রমণের কথা শুনে স্বয়ং একদল সৈন্য নিয়ে কলকাতায় আসেন। কয়েকটা ছোটখাটো যুদ্ধ হ'লো। যুদ্ধে কোনো পক্ষেরই বিশেষ কোনো সুবিধে হয়নি। শেষে উভয় পক্ষের চেষ্টায় একটা সন্ধি হয়।

সন্ধির পর সিরাজ সৈন্য নিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন। ইংরেজরা কলকাতায় থেকে আবার আগের মত বাণিজ্য করতে লাগলো।

পাঁচ

এই সময় ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীতে যুদ্ধ বাধে। এদেশে তখন ফরাসীদের ক্ষমতা খুব বেড়ে উঠছিল। ইংরেজরা তাদের খুব ভয় করতো। কলকাতার ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভ সাহেব মনে করলেন, যদি এদেশেও ইংরেজ-ফরসীতে যুদ্ধ বাধে, তবে নবাব সৈন্য হয়ত ফরাসীদের সাহায্য করবে। এই দু'দলে একত্র হ'লে ইংরেজের জয়ের আশা একেবারে নাই।........ভয়ে ইংরেজদের বুক-কেঁপে উঠল।

বাংলায় চন্দননগরই ফরাসীদের প্রধান আড্ডা এবং এখানেই তাদের কুঠী। ইংরেজরা মনে করলো, যদি এদেশে যুদ্ধ ঘোষণা হওয়ার আগেই তারা ফরাসীদের চন্দননগরের আড্ডা ভেঙ্গে দিতে পারে, তবে আর বিশেষ কোনো ভয়ের কারণ থাকবে না। তাই তারা বাংলাদেশ থেকে ফরাসীদের একেবারে উৎসন্ন দিতে উঠে-পড়ে লাগলো।

ফরাসীরা কিন্তু মনে ক'রেছিল, দেশে যুদ্ধ বেধেছে বাধুক,

তা নিয়ে এদেশে তারা কোনো গোলমাল বাধাবে না, বন্ধুভাবেই তারা এই সুদূর দেশে ইংরেজদের সঙ্গে কাটাবে।

সুচতুর সিরাজ ইংরেজদের ভাবগতিক দেখে বেশ স্পষ্টই বুঝেছিলেন, ইংরেজরা শীঘ্রই ফরাসীদের চন্দননগর আক্রমণ করবে। এদেশে যাতে বিদেশী বণিকেরা একটা যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি করতে না পারে, এই জন্যে তিনি হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারকে আদেশ ক'রে পাঠালেন এবং যুদ্ধ যদি বাধেই তবে তার ব্যবস্থার জন্য তিনি নন্দকুমারের কাছে দশ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। ইংরেজরা মনে করলো, বুঝি নবাব ফরাসীদের সাহায্যের জন্যই সৈন্য পাঠাচ্ছেন।

ফরাসীরা ইংরেজদের মনের ভাব বুঝতে পেরে চন্দননগরের দুর্গ তাড়াতাড়ি মেরামত ক'রে নিল। নিজেদের জাহাজ যাতে যাতায়াত করতে পারে, এই জন্যে এই একটা পথ রেখে গঙ্গার বাকী পথটা জাহাজ ডুবিয়ে বন্ধ ক'রে দিল। এসব চক্রান্ত ফরাসীরা ছাড়া আর কেউ জানতো না। টেরান্নু নামে একজন ফরাসী সৈন্য ইংরেজদের কাছে টাকা খেয়ে সমস্ত গুপ্ত কথা তাদের বলে দিল।

ইংরেজরা এদিকে নন্দকুমারকে হাত করবার চেষ্টা করতে লাগলো। যেন তিনি ফরাসীদের সাহায্য না করেন।

ইংরেজরা বিশ্বাসঘাতক ফরাসী সৈনিক টেরান্নুর পরামর্শ মত গুপ্ত পথ দিয়ে চন্দননগর আক্রমণ করলো। প্রায় আট ন

দিন ধরে ইংরেজ ও ফরাসীতে তুমুল যুদ্ধ হলো। নন্দকুমার কোনো পক্ষেই সাহায্য না করে চুপ চাপ বসে রইলেন।

ফরাসীরা যুদ্ধে হেরে গেল। তাদের বহু সৈন্য নষ্ট হলো —কতক নিহত, কতক বন্দী এবং কতক আহত হলো ; অনেকে নানাদিকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালো।

নন্দকুমার কেন ফরাসীদের সাহায্য না করে চুপ করে বসে রইলেন, এজন্যে অনেকে অনেক কথা বলে থাকে। কেউ বলে, তিনি ইংরেজদের কাছে থেকে বার হাজার টাকা ঘুষ খেয়ে দূরে সরে ছিলেন ; কেউ বলে, এই সেদিন ইংরেজদের সঙ্গে নবাব-সৈন্যের যুদ্ধ হয়ে সন্ধি হয়ে গেল, আবার তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা সঙ্গত নয় বলে তিনি চুপ করে ছিলেন। যে কারণেই হোক, নন্দকুমার ফরাসীদের সাহায্য করেন নি। যদি তিনি নবাবের প্রেরিত সেই দশ হাজার সৈন্য নিয়ে ফরাসী-পক্ষে যোগ দিতেন তবে সেদিনই ইংরেজদের সমস্ত আশা-ভরসা নির্ম্মূল হয়ে যেতো, আর তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতো না, পলাশীর যুদ্ধেও নবাব সিরাজউদ্দৌলার এবং বাংলাদেশের সর্ব্বনাশ হতো না। নন্দকুমার শেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই ভুল সংশোধনের চেষ্টাও যথেষ্টই করেছিলেন। কিন্তু যে গাছ একবার কেটে ফেলেছেন, তাকে আর তিনি শত চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারলেন না।

নন্দকুমারের শত্রুরা নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে বুঝিয়ে দিল

যে, নন্দকুমার ইংরেজের কাছ থেকে বার হাজার টাকা খেয়ে ফরাসীদের সাহায্য করেন নি। সিরাজ এই কথাই বিশ্বাস করে নন্দকুমারকে পদচ্যুত করেন।

সেই দিন যদি নন্দকুমার ফরাসীদের সাহায্য করতেন, তবে ইংরেজরা কিছুতেই সে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারতো না। শুধু জয়লাভই নয়, ফরাসীদের সঙ্গে সেদিনকার যুদ্ধে যদি তারা হেরে যেতো, তবে বোধ হয় ভারতে রাজ্য প্রতিষ্ঠা তাদের ভাগ্যে ঘটতো না। এই হিসাবে নন্দকুমার ইংরেজদের পরম বন্ধুর কাজ করেছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু শেষে ইংরেজরা তাঁদের এই পরম বন্ধুকে মিথ্যা অপরাধে জড়িয়ে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিয়ে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখিয়েছিলেন।

ছয়

কয়েক মাস পরেই পলাশীর মাঠে ইংরেজদের সঙ্গে নবাব সিরাজউদ্দৌলার যুদ্ধ হলো। নবাবের অনেক কর্ম্মচারী এবং দেশের কতকগুলো বড় বড় লোক সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে এই যুদ্ধ বাধিয়েছিল। সিরাজের কড়া শাসনে তাদের অনেকেরই অনেক বিষয়ে অসুবিধা হচ্ছিল, তাই তারা তাদের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে ইংরেজদের সাহায্য নিয়ে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করবার ষড়্‌যন্ত্র করে এই যুদ্ধ বাধিয়েছিল।

তারা যে ঠিক ইংরেজদের হাতেই রাজ্য ও সিংহাসন তুলে দেবে তা মনে করে নি। তারা ভেবেছিল, ইংরেজরা সাতসমুদ্র-তেরনদী ডিঙ্গিয়ে এদেশে এসেছে বাণিজ্য করতে, যদি তাদের বাণিজ্যের সুবিধা করে দেওয়া যায়, তবেই তারা সন্তুষ্ট থাকবে, রাজত্বের লোভ হবে না। কিন্তু ইংরেজরা যে এদেশে বাণিজ্য করতে করতে রাজত্ব করবারও একটা মস্তবড় আশা মনের নীচে অতি গোপনে পোষণ করছিল, সে ধারণাটা চক্রান্তকারীদের মাথায় ঢোকে নি।

নন্দকুমারকে সিরাজ পলাশীর যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বেই পদচ্যুত করেছিলেন, তা বলে কিন্তু নন্দকুমার সেই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এই ষড়্‌যন্ত্রকারীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিমকহারামো করেননি। এটা নন্দকুমারের মহত্ত্বই বলতে হবে।

যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকদের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজের পরাজয় হলো। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন, বৃহস্পতিবার পলাশীর মাঠে বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য্য ডুবে গেল। যারা রাজকার্য্য পরিচালনে সিরাজের সহায় ছিল, তারা প্রায় সকলেই সিরাজের এই সর্ব্বনাশের ষড়্‌যন্ত্রে ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করেছিল। কাজেই, সিরাজ রাজ্যের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে বেগম লুৎফউন্নিসার হাত ধরে সাধের মুর্শিদাবাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

একদিন যাঁর প্রতাপে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা কম্পিত হতো, সেই সিরাজ আজ ভিখারীর চেয়েও হীন হয়ে প্রাণের ভয়ে

পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন; ইংরেজ সৈন্য মুর্শিদাবাদ লুঠ ক'রে নিল। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে ক্লাইভ সাহেব হাত ধ'রে বাংলার মস্‌নদে বসিয়ে নবাব বলে স্বীকার করলেন।

আর সিরাজ ?........

তাঁর যে দুর্গতি হ'লো, লিখে বা ব'লে তা বোঝানো যায় না। কয়েক দিন পরে শত্রুপক্ষের লোকেরা তাঁকে বন্দী ক'রে মুর্শিদাবাদে নিয়ে এলো। সিরাজ বেঁচে থাকলে হয়ত একটা গোলমাল হ'তে পারে এই ভয়ে তাঁকে হত্যা করা হ'লো।

শুধু কি হত্যা ?........

তা নয়। সিরাজের রক্তাক্ত দেহ এবং ছিন্ন মস্তক হাতীর পিঠে চাপিয়ে সমস্ত মুর্শিদাবাদ সহরময় ঘুরিয়ে লোককে দেখিয়ে আনা হ'লো। লোকে শিউরে উঠলো বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হতভাগ্য সিরাজের এই পরিণাম দেখে।

মীরজাফর সিংহাসনে বসলেন বটে, কিন্তু তিনি নামে মাত্র নবাব হ'লেন। দেশের প্রকৃত মালিক হলো ইংরেজ।

এক রাজত্ব শেষ হ'য়ে অন্য রাজত্ব আরম্ভ হওয়ার সময় দেশে একটা ভীষণ গোলমালের সৃষ্টি হ'য়ে থাকে। নবাবী আমল গিয়ে ইংরেজের আমল আরম্ভ হওয়াতে দেশে ঐরকম একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো। চতুর ক্লাইভ তখন নন্দকুমারের সাহায্যে সেই গোলমাল থামাতে পেরেছিলেন। ক্লাইভ জানতেন, নন্দকুমার একজন বুদ্ধিমান্ রাজনীতিক, কৌশলী এবং বহুদর্শী

লোক ; তাঁর সাহায্য পেলে তিনি অনেক বিপদ আপদের হাত থেকে রক্ষা পাবেন। তাই তিনি নন্দকুমারকে তার দেওয়ান নিযুক্ত করলেন।

সমস্ত গুরুতর ব্যাপারেই ক্লাইভ নন্দকুমারের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। ইউরোপীয় এবং দেশীয় মহলে ক্রমে নন্দকুমারের ক্ষমতা ও খ্যাতি বাড়তে লাগলো। ক্লাইভ যেমন 'কর্ণেল ক্লাইভ' নামে পরিচিত হ'লেন, নন্দকুমারও তেমনি 'কালো কর্ণেল' নামে ইংরেজ ও বাঙ্গালীর কাছে পরিচিত হ'য়ে সম্মান পেতে লাগলেন।

মীরজাফর নবাব হ'তে পারলে ক্লাইভকে বিস্তর টাকা দিবেন বলে প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু নবাব হ'য়ে সেই টাকা দিতে না পারায় তিনি ক্লাইভকে বর্দ্ধমান, হুগলী ও নদীয়া জেলার প্রজাদের কাছ থেকে খাজনার টাকা আদায় ক'রে নিতে বললেন। প্রজারা এতদিন নবাবকে খাজনা দিয়ে আসছিল এবার ইংরেজকে খাজনা দিতে তারা আপত্তি করতে লাগলো। ক্লাইভ দেখলেন, নন্দকুমার বহুদিন ধ'রে জমিদারীর কাজ ক'রে আসছেন আর বিশেষতঃ তিনি বাঙ্গালী, তাঁর পক্ষে খাজনা আদায় করা কঠিন হবে না। তাই তিন তাঁকে তহশীলদার ক'রে খাজনা আদায়ের ভার দিলেন। নন্দকুমার হুগলীতে থেকে খাজনা আদায় করতে লাগলেন।

তাঁর প্রতাপে এবং ক্ষমতায় অনেক বড় বড় জমিদার সন্ত্রস্ত

হ'য়ে উঠল। যাদের কাছ থেকে ইংরেজেরা ভয় দেখিয়েও খাজনা আদায় করতে পারেনি, নন্দকুমার অনায়াসে সে সমস্ত বাকী খাজনা আদায় করতে লাগলেন।

এই জমিদারদের মধ্যে নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন একজন। তাঁর কাছে ইংরেজদের বহু টাকা খাজনা বাকী প'ড়ে ছিল। ইংরেজরা কিছুতেই তা' আদায় করতে পারছিল না। এমন কি, টাকা না দিলে তারা তাঁকে ধ'রে জোর ক'রে খ্রীষ্টান ক'রে দেবে এবং কয়েদ ক'রে রাখবে ব'লে ভয় দেখিয়েও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে পারে নি। নন্দকুমার তহশীলদারী পেয়েই একদল সিপাহী পাঠিয়ে দিলেন কৃষ্ণনগরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে ধ'রে আনবার জন্যে; সিপাহী আসছে শুনে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সমস্ত বাকী খাজনা শোধ ক'রে দিলেন।

সাত

যিনি ভারতবর্ষের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হ'য়েছিলেন, যাঁর চক্রান্তে মিথ্যা জাল অপরাধে শেষে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী হ'য়েছিল, সেই হেষ্টিংস্ সাহেব এই সময় মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং তিনিই ঐ তিনটি জেলার (বর্দ্ধমান, হুগলী ও

নদীয়া) খাজনা আদায়ের কর্ত্তা ছিলেন। এতে তাঁর বেশ দু'পয়সা উপরি পাওনা ছিল। নন্দকুমারের উপর খাজনা আদায়ের ভার পড়ায় হেষ্টিংসের সেই বড় একটা আয়ের পথ বন্ধ হ'য়ে গেল। নন্দকুমার তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিলেন দেখে রাগে হিংসায় তিনি জ্বলতে লাগলেন। কিন্তু ক্লাইভ নন্দকুমারের পক্ষে থাকায় তিনি তাঁর কিছুই ক'রে উঠতে পারেননি। সেই থেকে নন্দকুমারের উপর হেষ্টিংসের রাগ; তিনি পদে পদে তাঁর অনিষ্টের চেষ্টা করতে লাগলেন।

নবাব মীরজাফরও নন্দকুমারকে বিষনজরে দেখতে লাগলেন। তিনি নিজের পথ নিষ্কণ্টক করার জন্য রায়দুর্লভকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু নন্দকুমারের জন্য পেরে উঠেন নি বল্লে তার এই রাগ।

মীরজাফরের ভাগ্যে বেশীদিন বাংলার সিংহাসন ভোগ করা ঘটে উঠল না। তিন বছর চার মাস নবাবী করবার পরই নানা কারণে ইংরেজরা তাঁকে সরিয়ে তাঁর জামাতা মীর কাশিমকে সিংহাসনে বসালেন। যাদের জন্য মীরজাফর পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে অতবড় একটা নিমকহারামি করে সিরাজের ও বাংলার সর্ব্বনাশ ক'রেছিলেন—যার জন্য ইংরেজের ভারত-জোড়া রাজ্য, সেই তাঁর পরমবন্ধু ইংরেজরা আর তাঁকে বিশ্বাস ক'রে তাঁর হাতে বাংলার সিংহাসন রাখতে পারলেন না। বিশ্বাসঘাতকদের পরিণাম এমনই হ'য়ে থাকে।

এই সময় ক্লাইভ দেশে চলে গেলেন। নন্দকুমারও চাকরী ছেড়ে দিয়ে হুগলী থেকে কলকাতায় এসে বাস করতে লাগলেন। ভ্যান্সিটার্ট সাহেব কলকাতার গভর্ণর হলেন। গভর্ণর হ'য়ে তিনি সমস্ত বিষয়ে নন্দকুমারের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতে লাগলেন।

মীরজাফরকে পদচ্যুত করায় ইংরেজরা দেশের লোকের কাছে অবিশ্বাসী হ'য়ে উঠলো। তাদের উপর দেশবাসীর নানা সন্দেহ হতে লাগলো। মীরজাফর দেখলেন, গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট সাহেবের কাছে নন্দকুমারের খুব খাতির, এই বিপদের সময় নন্দকুমারকে ধরতে পারলে হয়ত যথেষ্ট উপকার হবে। এই ভেবে তিনি গিয়ে নন্দকুমারের সাহায্যপ্রার্থী হলেন।

মীরজাফরের হাত থেকে সিংহাসন কেড়ে নেওয়া যে ইংরেজদের পক্ষে সঙ্গত কাজ হয়নি, সে কথা নন্দকুমারও বুঝতে পেরেছিলেন। এ অন্যায় তিনি সহ্য করতে পারলেন না, মীরজাফর আগে তাঁর সঙ্গে শক্রতা করলেও এই বিপদে নন্দকুমার তাঁর উপকারের জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন। তিনি বুঝেছিলেন, হিন্দু-মুসলমান এদেশের অধিবাসী, এদেশ তাঁদের, তাঁরাই এদেশের প্রকৃত মালিক, এদেশের রাজা হবেন তাঁরাই। ইংরেজ এদেশে এসেছে কোন্ সুদূর দেশ থেকে সাতসমুদ্র-তেরনদী পেরিয়ে বাণিজ্য করতে; বাণিজ্যই করুক তারা, দেশের শাসন-ব্যাপারে তারা হস্তক্ষেপ করবে কেন?

দেশের লোকেরা মীরজাফরের প্রতি ইংরেজদের দুর্ব্ব্যবহার দেখে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিল। অনেকেই মনে মনে মীরজাফরকে সাহায্য করতেও ইচ্ছুক ছিল। নন্দকুমার দেশের এই হাওয়া বুঝে মনে মনে সঙ্কল্প করলেন, যদি দেশের বড় বড় লোকদের একত্র করে এই বিদেশী বণিকদলের বিরুদ্ধে দাঁড়ান যায়, তবে তাদের প্রভাব নষ্ট করতে বেশী দেরী হবে না। তাই তিনি দেশের জমিদার এবং ক্ষমতাশালী লোকদের সাহায্য লাভের চেষ্টা করিতে লাগলেন।

বর্দ্ধমানের মহারাজ ইংরেজদের ব্যবহারে পূর্ব্ব থেকেই খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন। এমন কি, তিনি তাঁর জমিদারীর মধ্যে ইংরেজদের বাণিজ্য পর্য্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। নন্দকুমার বর্দ্ধমানের মহারাজ, মারাঠা সেনাপতি শ্রীভট্ট, বিহারের জমিদার কামাগর খাঁ প্রভৃতির সঙ্গে যোগ দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। দূত দিয়ে নানা জয়গায় চিঠিপত্র পাঠিয়ে সকলকে তাঁর উদ্দেশ্য জানালেন।

নন্দকুমারের একখানা চিঠি হঠাৎ ইংরেজদের হাতে পড়ে গেল। ভ্যান্সিটার্ট সাহেব এই চিঠি পেয়ে তৎক্ষণাৎ নন্দকুমার, রায়দুর্ল্লভ এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ীতে কড়া পাহারা বসালেন এবং তাঁদের বাড়ী তল্লাসী করে কাগজ-পত্র সব নিয়ে গেলেন। সেই সকল কাগজ-পত্র ইংরাজীতে অনুবাদ করবার ভার পড়ল নন্দকুমারের চিরশত্রু

হেষ্টিংসের উপর। নন্দকুমার কয়েকদিন প্রহরিবেষ্টিত থেকে শেষে মুক্তি পেলেন।

কিছুদিন পরে নন্দকুমার আবার ভ্যান্সিটার্ট সাহেবের বিষ নজরে পড়লেন। ইংরেজরা এদেশে যে অত্যাচার ও অন্যায় কাজ করেছিল তা' বিলাতের ডাইরেক্টর সভার জানা ছিল না, নন্দকুমার ইংরেজদের সেই কুকীর্ত্তিগুলো তাদের জানিয়ে দেওয়ার জন্য ছ'খানা চিঠি মীরজাফরের নামের মোহর দিয়ে বিলাতে পাঠিয়ে দিলেন,—একখানা ক্লাইভের কাছে, আর একখানা ডাইরেক্টর সভার সভ্যদের কাছে। কিন্তু নন্দকুমারের ছুর্ভাগ্য যে, তাঁর সে চিঠি ছ'খানাই বিলাতে না পৌছে, ভ্যান্সিটার্ট সাহেবের হাতে গিয়ে পড়লো। চিঠি ছ'খানা বিলাতে পৌছতে পারলে ইংরেজদের অত্যাচারের অনেকটা প্রতিবিধান হতো। ভ্যান্সিটার্ট সাহেব সে চিঠি পেয়ে নন্দকুমারের উপর আরো জ্বলে উঠলেন। তিনি নন্দকুমারের উপর এমন কড়া পাহারার ব্যবস্থা করলেন যে, নন্দকুমারের কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেল। বন্দী হয়ে নন্দকুমার একটুও দম্‌লেন না, তিনি মীরজাফরকে সাহায্য করবেন কথা দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি পালন করতে বদ্ধপরিকর হলেন। কোন রকম ভয় তাকে টলাতে পারলে না। বন্দী থেকেও তিনি নানা ভাবে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন।

ইংরেজদের গুপ্তচরের অভাব ছিল না, তাই নন্দকুমারের

ষড়যন্ত্রের অনেক কথাই ভ্যান্সিটার্ট সাহেবের কানে গিয়ে পৌঁছতে লাগলো।

এক বছর নন্দকুমার ঐ রকম বন্দী হয়ে ছিলেন। বন্দী অবস্থায় তিনি গভর্ণর ভান্সিটার্টের কাছে এই বলে এক দরখাস্ত করেন যে, তাঁকে অন্যায় রকমে বন্দী করে রাখা হয়েছে; হয় তাঁকে মুক্তি দেওয়া হোক, আর না-হয় ইংলণ্ডের আইন অনু-সারে তাঁর বিচার করে যা' ব্যবস্থা হয়, করা হোক। মুক্তি পেলে তিনি ইংরেজের মুলুক ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে বাস করবেন। কিন্তু তাঁর এ প্রার্থনা বিফল হলো। নন্দকুমারের যেমন প্রতিপত্তি, তাতে তিনি দূরে সরে গিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে হয়ত একটা তুমুল কাণ্ড করে তুলবেন—এই ভয়ে ইংরেজরা তাঁকে ছেড়ে দিতে রাজি হল না।

আট

মীরকাশিমকে ইংরেজরা বাংলার মস্‌নদে বসিয়ে ছিলেন, তাঁকে তাদের হাতের খেলার পুতুল করে রাখবেন মনে ক'রে। কিন্তু মীরকাশিম সে ছেলেই ছিলেন না। তিনি মনে করলেন, —"নবাবী যদি করতে হয়, তবে করবো ঠিক নবাবের-ই মত, ইংরেজরা কে যে, তাদের কথায় আমাকে উঠতে বস্‌তে হবে!

তারা দোকানদারী করতে এসেছে, দোকানদারীই করুক. নবাবের উপর কর্তৃত্ব করবার তাদের কি অধিকার আছে ? নবাব-ই হচ্ছেন দেশের রাজা ; সুতরাং, ইংরেজদের তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে। সাতসমুদ্র-তেরনদী পারের একদল দোকানদারের কর্তৃত্ব আমি সইতে পারবো না।

এই কর্তৃত্ব নিয়েই মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের ঝগড়া সুরু হলো। ইংরেজরা মীরকাশিমকে সিংহাসন ছেড়ে দিতে বল্লেন। মীরকাশিম উত্তর করলেন, "তোমরা কে হে বাপু, যে তোমাদের হুকুম আমায় মানতে হবে ?"

মীরকাশিম নবাবী ছাড়তে রাজি নন। ইংরেজরাও তাঁকে নবাব রাখতে ইচ্ছুক নন। মীরকাশিম নবাব থাকলে তাঁদের খাম-খেয়ালী এবং অত্যাচার রীতিমত চলবে না,—স্বার্থ নষ্ট হ'য়ে যাবে। কাজেই, মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধলো। যুদ্ধে ইংরেজদের চক্রান্তে ও বিশ্বাসঘাতকদের বিশ্বাসঘাতকতায় মীরকাশিম জয়ী হতে পারলেন না। তিনি বন্দী হলেন ; শেষে অতি শোচনীয়ভাবে তাঁর জীবন শেষ হলো।

এইবার মীরজাফরের ভাগ্য ফিরলো। তিনি ইংরেজদের সঙ্গে কতকগুলো চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে আবার বাংলার সিংহাসন ফিরে পেলেন। সিংহাসন পেলেন সত্য, কিন্তু নবাবের যে ক্ষমতা তার অধিকাংশ থেকেই তিনি বঞ্চিত হলেন।

মীরজাফর নবাব হয়ে নন্দকুমারের কথা ভোলেন নি।

তিনি তাঁকে তাঁর মন্ত্রী এবং বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত করলেন।

নন্দকুমারের এই ক্ষমতা লাভ ইংরেজদের কিন্তু মোটেই ভাল লাগলো না। দিল্লীর বাদশাহের দরবারে নন্দকুমারের যথেষ্ট সুনাম ছিল। বাদশাহ নন্দকুমারকে 'মহারাজ' উপাধি সহ সাত হাজার সৈন্যের নায়ক করে এক সনন্দ পাঠিয়ে দিলেন। নন্দকুমার এইবার মহারাজ নন্দকুমার হ'লেন। তাঁর এই সম্মান ও ক্ষমতালাভ দেখে ঈর্ষ্যায় তাঁর শত্রুদের বুক জ্বলে উঠলো, ভয়ে আত্মারাম শুকিয়ে গেল। সর্ব্বদাই তারা তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো।

মহারাজ নন্দকুমার এখন দেশের সর্ব্বপ্রধান লোক। নবাব মীরজাফরের উপরেও তাঁর ক্ষমতা। মীরজাফর নামে মাত্র নবাব, নবাব বলতে নন্দকুমারকেই নবাব বলা চলে। রাজ্যের যে কোনো কাজে নন্দকুমারের আদেশ আবশ্যক, তাঁর হুকুম ছাড়া কোনো কিছু হওয়ার উপায় নাই। তিনি রাজ্যের বাকী খাজনা কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করে আদায় করতে লাগলেন। তাঁর কাছে কোন অবিচার ছিল না। নবাবেরা সাধারণতঃ বড় অমিতব্যয়ী হ'য়ে থাকেন। নন্দকুমার মীর-জাফরের বাজে খরচা অনেক কমিয়ে দিলেন। ইংরেজ-কুঠীর অনেক কর্ম্মচারী কোম্পানীর নাম দিয়ে নিজেরা বিনা খাজনায় অনেক জায়গায় বাণিজ্য করতো ; এই বাণিজ্য করা নিয়ে তারা

দেশের লোকের উপর অনেক সময় ভয়ানক অত্যাচার করতো।

মহারাজ নন্দকুমার এই বে-আইনি বাণিজ্য এবং অত্যাচার বন্ধ করবার জন্য অনেক চেষ্টা করতে লাগলেন।

নন্দকুমার মীরজাফরের মন্ত্রী থাকায় ইংরেজদের অনেক অসুবিধা হচ্ছিল। তিনি মন্ত্রী না থাকলে আর কর্ত্তৃত্ব করতে পারবেন না, এই কারণে ইংরেজরা তাঁকে পদচ্যুত করার জন্য অনেকবার মীরজাফরকে অনুরোধ ক'রেছিল, কিন্তু মীরজাফর সে অনুরোধে ভ্রূক্ষেপ করেন নি।

নয়

মীরজাফরের অদৃষ্টে বেশীদিন আর নবাবী করা ঘটল না। পরপার থেকে তাঁর মৃত্যুর ডাক এলো। তিনি কঠিন অসুখে পড়লেন, বহু চেষ্টাতেও সে রোগ সারলো না। মরণকালে তিনি তাঁর পুত্র নাজিমউদ্দৌলাকে নবাব ক'রে গেলেন এবং মহারাজ নন্দকুমারের মন্ত্রিত্ব যাতে অব্যাহত থাকে, সে জন্য তিনি বিশেষভাবে ব্যবস্থা করলেন।

মীরজাফরের মৃত্যু ইংরেজদের খুব একটা আনন্দের কারণ হলো। কেন না, পুরাতন নবাবের মৃত্যুর পর এবং নূতন নবাবের নবাবীর কিছুদিন পর্য্যন্ত দেশে যে এক আধটু গোল-

মালের সৃষ্টি হয়, সেই সুযোগে ইংরেজরা বেশ দু'পয়সা রোজগার ক'রে নিতে পারতো। কিন্তু তারা যখন শুনলো, এবারও মহারাজ নন্দকুমার মন্ত্রিত্ব করবেন, তখন তাদের আনন্দ বিষাদে পরিণত হলো ; কারণ, নন্দকুমার বড় কঠিন লোক, তাঁর চোখে ধূলো দিয়ে কিছু করবার উপায় নাই। এই জন্য তারা নন্দকুমারকে সরাবার চেষ্টা করতে লাগলো।

ভান্সিটার্ট সাহেব তখন দেশে চলে যাওয়ায় কলকাতার গভর্ণর হয়েছেন স্পেন্সার সাহেব।

ইংরেজরা সবাই মিলে মহারাজ নন্দকুমারকে অপদস্থ করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। তারা সত্য-মিথ্যা নানা রকম অভিযোগ তুলে কোম্পানীর বড়কর্ত্তাদের কাছে এই প্রমাণের চেষ্টা করতে লাগলো যে, নন্দকুমার ভীষণ অত্যাচারী লোক, তিনি নবাবের মন্ত্রী থাকলে কোম্পানীর উন্নতিতে ভয়ানক আঘাত লাগবে, এমন কি এদেশ থেকে কোম্পানীকে পাত্‌তাড়ি পর্য্যন্ত গুটোতে হতে পারে। তাই তারা পরামর্শ করলো, নন্দকুমারকে বন্দী ক'রে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় এনে তাঁর অপরাধের বিচার করতে হবে। বিচার করবেন ইংরেজদের কলকাতার বোর্ডের সভ্যেরা।

ইংরেজরা নবাব নাজিমউদ্দৌলাকে চিঠি লিখলো, মহারাজ নন্দকুমারকে বন্দী করে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য।

নবাব সমস্তই বুঝতে পারলেন। তিনি বেশ জানতেন যে,

মহারাজ নন্দকুমার তাঁর মন্ত্রী না থাকলে তিনি ইংরেজদের চক্রান্তের সুমুখে দাঁড়িয়ে নবাবী করতে পারবেন না। তাই তিনি ইংরেজদের কথায় ভ্রূক্ষেপ না ক'রে চুপ ক'রে রইলেন। ইংরেজরাও ছাড়বার পাত্র নয়। তারা নবাবকে নানা রকম ভয় দেখিয়ে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো।

নবাব শেষে বাধ্য হ'য়ে ইংরেজদের জানালেন যে, তিনি স্বয়ং মহারাজকে সঙ্গে ক'রে কলকাতায় নিয়ে যাবেন, আর তাঁর বিচারের সময় তিনি সেখানে উপস্থিত থেকে বিচার শুনবেন।

ইংরেজরা কিন্তু এতে রাজি হলো না। তারা ভাবলো, নবাব যদি মহারাজকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসেন, তবে যারা তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হ'য়েছিলো, নবাবের ভয়ে আর তারা সাক্ষ্য দেবে না; আর তা' হ'লে নন্দকুমারকে ফাঁদে ফেলা সহজ হবে না।

নবাব নাজিমউদ্দৌলার ক্ষমতা তখন আর আগেকার নবাব-দের মত ছিল না, তিনি অনেক দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছিলেন। ওদিকে আবার ইংরেজরা ক্রমশঃই শক্তিশালী হ'য়ে উঠছিল। তাই তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মহারাজ নন্দকুমারকে রক্ষা করতে সাহসী হ'লেন না।

দশ

মহারাজ নন্দকুমার ইংরেজদের হাতে বন্দী হলেন। ইংরেজরা তাঁকে তৎক্ষণাৎ নৌকা ক'রে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় এনে মহারাজের বিচারের জন্য বিষম কাণ্ড আরম্ভ করে দিল। নানা দিক্ থেকে সব সাক্ষী যোগাড় হ'তে লাগলো। বহু দূর দেশ থেকে অনেক ইংরেজ সাক্ষ্য দিতে কলকাতায় উপস্থিত হ'লেন। মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে একটা মস্ত বড় ষড়যন্ত্রের মামলা তৈরী করা হ'লো। ইংরেজদের প্রাণে আর আনন্দ ধরে না। এবার তারা তাদের পরম শত্রু নন্দকুমারকে সমূলে ধ্বংস ক'রে তাদের পথ পরিষ্কার করবে।

এই সময় লর্ড ক্লাইভ বিলাত থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছুলেন। তিনি মহারাজকে খুব সৎ লোক বলেই জানতেন। তিনি নন্দকুমারের বিচারের ভার নিজের হাতে নিলেন।

যত রকমে সম্ভব ইংরেজরা নন্দকুমারের নামে ক্লাইভের কাছে দুর্নাম রটাতে লাগলো। ক্লাইভ বুঝতে পারলেন, স্বার্থে আঘাত লাগায় নন্দকুমারের বিরুদ্ধে একটা মস্ত বড় মিথ্যা ষড়যন্ত্র করেছে সব ইংরেজরা মিলে। বিচারে তিনি মহারাজকে অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিলেন। কাজেই, ইংরেজদের সেবারকার চেষ্টা ব্যর্থ হ'লো; ষড়যন্ত্রকারীদের সকলের মুখ হেঁট হ'য়ে গেল। তারা বড় আশা ক'রেছিল, নন্দকুমারকে একটি বড় সাজা দিয়ে তাদের স্বার্থ-সাধনের পথ প্রশস্ত ক'রে নেবে,

কিন্তু তা' হলো না। এই জন্য ক্লাইভের উপর অনেক ইংরেজ মনে মনে খুব অসন্তুষ্ট হলো।

ভ্যান্সিটার্ট সাহেব যখন কলকাতার গভর্ণর ছিলেন, তখন ইংরেজ কুঠীর কর্ম্মচারীরা নানারকমে অন্যায় ভাবে টাকা রোজগার আরম্ভ করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যে ভাবেই হউক, বহু টাকা নিয়ে দেশে ফিরতে হবে। স্বদেশ থেকে এই ধারণা নিয়েই তারা ভারতে আসতো। সত্যি সত্যি, এদেশে তারা আসতো খালি হাতে, আর ফিরবার সময় ফিরতো এক একজন লাখ লাখ টাকার মালিক হয়ে। এই অর্থোপার্জ্জনের জন্য তারা যে-কোনো অত্যাচার করতে কুণ্ঠিত বা বিচলিত হতো না। তাদের এই অর্থ শোষণের জন্য সারা দেশময় হাহাকার উঠতো।

ক্লাইভ দেশ থেকে ফিরে এসে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের এই অন্যায় ভাবে অর্থ উপার্জ্জনের পথ বন্ধ করতে চেষ্টা করলেন। কেবল যে ইংরেজরাই অন্যায় এবং অসদুপায়ে টাকা রোজগার করতো তা' নয়, তাদের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের কতকগুলি লোকও বিশেষ সুবিধা করে নিয়েছিল,—এদের সাহায্যেই ইংরেজরা এদেশে টাকা রোজগারের পথ সহজ করে নিয়েছিল। এদের 'বেনিয়ান' বলা হতো। এই বেনিয়ানেরা তাদের ইংরেজ মনিবদের মনস্তুষ্টির জন্য না করতো এমন ঘৃণিত কাজ ছিল না। দেশের লোকেরা তখন এই বেনিয়ানদের যমদূতের মত ভয় করতো। এদের অত্যাচারে কত গৃহস্থকে যে ভিটা-মাটি পর্য্যন্ত

ছেড়ে পালাতে হয়েছে তার অন্ত নাই। বহুলোক সর্ব্বস্বান্ত হয়ে এসে মহারাজ নন্দকুমারকে তাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা জানাতে লাগলো, তারা তখনো তাঁকে দেশের মধ্যে একজন প্রধান লোক বলে মনে করতো। মহারাজ চিরদিনই বিপন্নের বন্ধু ছিলেন; তিনি দেশের লোকের উপর এ অত্যাচার সহ্য করতে পারলেন না। যাতে অত্যাচার বন্ধ হ'য়ে যায় সেজন্য তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন। এতে ইংরেজ কুঠীর ইংরেজ এবং দেশীয় কর্ম্মচারীরা তাঁর উপর খড়্গহস্ত হ'য়ে উঠলো।

লর্ড ক্লাইভও সমস্ত বুঝতে পেরে কর্ম্মচারীদের অন্যায় অত্যাচার দমনের চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি মনে করলেন, মহারাজ নন্দকুমারই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক, তাঁর হাতে অনুসন্ধানের ভার দিলে ঠিক সংবাদ পাওয়া যাবে।

নন্দকুমার অনেক চেষ্টা-যত্নে অন্যায় অত্যাচারের একটা মস্ত বড় তালিকা তৈরী করে ক্লাইভের হাতে দিলেন।

এগারো

১১৭৬ সাল।

বাংলার বড় একটা দুর্দ্দিন!

ভয়ানক দুর্ভিক্ষের আকাশভেদী চীৎকারে বাংলার গগন পবন কেঁপে উঠেছে।

তেমন দুর্ভিক্ষের কথা কেহ কখন শুনে নি। সে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ কথা শুনলে আজও লোকের প্রাণ কেঁপে উঠে, ভয়ে বুক শুকিয়ে যায়, চোখ জলে ভ'রে আসে। গাছের পাতা, মাঠের দূর্ব্বা, পুকুরডোবার শামুক-গুগ্‌লি পর্য্যন্ত লোকে পেটের জ্বালায় খেয়ে শেষ করেছিল। মা ছেলের মুখ থেকে খাবার কেড়ে খাচ্ছে, পেটের দায়ে লোকে ছেলেমেয়ে পর্য্যন্ত বিক্রয় করছে! চারদিকে মড়ক, পথে ঘাটে হাটে বাজারে যেখানে সেখানে মড়া প'ড়ে পচছে, নদী দিয়ে শত শত মড়া ভেসে যাচ্ছে; চারদিকে দুর্গন্ধ,শিয়াল কুকুর শকুনি গৃধিনীর অবিরাম চীৎকার! দেশ মহা-শ্মশান! এই দুর্ভিক্ষের নাম ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

এই দুর্ভিক্ষের সময় মহারাজ নন্দকুমার তাঁর জন্মভূমি ভদ্রপুরে এবং অন্যান্য জায়গায় অন্নসত্র খুলে বহুলোককে অন্নদান ক'রে মরণের মুখ থেকে রক্ষা ক'রেছিলেন।

দেশের যখন এই অবস্থা, দেশের লোক যখন একমুষ্টি ভাতের অভাবে পথের ধারে, বড় লোকের বাড়ীর দরজায়, ইংরেজ কুঠীর সুমুখে ছট্‌ফট্‌ ক'রে মরছিল, অন্যান্য বছরের চেয়ে সেই বছর ইংরেজরা তাদের বকেয়া এবং হাল খাজনা কড়ায়-গণ্ডায় সুদে-আসলে আদায় করবার জন্য উঠে প'ড়ে লাগলো। লোকে খেতে না পা'ক, পেটের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ ক'রে মরুক—ইংরেজের টাকাটি পূরোপূরি আদায় হওয়া চাই। কুঠীর কর্ম্মচারীরা ঘটিবাটি, জমিযায়গা বেচে টাকা আদায়

করতে লেগে গেল। সব বছরের চাইতে সেই বছর খাজনা আদায় হয়েছিল বেশী!

ইংরেজের কর্ম্মচারী মহম্মদ রেজাখাঁ অন্যান্য সাহেব ও দেশীয় কর্ম্মচারীদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে আগেই প্রজাদের কাছ থেকে সমস্ত শস্য কিনে রেখে দিয়েছিল; দুর্ভিক্ষের সময় সেই সমস্ত শস্য বহুগুণ মূল্যে বেচে সে যথেষ্ট লাভ করতে আরম্ভ করে। এই লাভের অংশ ইংরেজদের ভাগেই পড়েছিল বেশী।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ এই দুর্ভিক্ষের কয়েক বৎসর পরে কলকাতার গভর্ণর হ'লেন। তিনি প্রথমে কোম্পানীর অধীনে বার্ষিক মাত্র ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরী নিয়ে এদেশে এসেছিলেন, কপাল গুণে এইবার গভর্ণরী পেয়ে বসলেন। তিনি যখন কোম্পানীর সামান্য মাত্র কর্ম্মচারী ছিলেন, সেই সময় থেকেই তিনি মহারাজ নন্দকুমারের উপর চটা ছিলেন। গভর্ণরী পেয়ে হেষ্টিংস্ পূর্ব্বের সেই শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে সঙ্কল্প করলেন।

হেষ্টিংসের চরিত্রে দোষ ছিল বহু, ঘুস খাওয়া তার মধ্যে একটা বড় দোষ ছিল। তিনি ছিলেন ঘোর অর্থলোভী, টাকা রোজগারের জন্যে তিনি বহু অন্যায় কাজ এবং প্রজাদের উপর নানা নৃশংস অত্যাচার ক'রেছেন। মহারাজ নন্দকুমার এসব জানতেন, পাছে তিনি এসব প্রকাশ ক'রে দেন, এইজন্য হেষ্টিংস্ তাঁর সর্ব্বনাশ করবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করতে আরম্ভ

করলেন। নিজে ভাল মানুষটি থাকার মতলবে তিনি বিলাতে মহারাজ নন্দকুমারের অনেক দোষ দেখিয়ে গোড়া থেকেই চিঠিপত্র লিখতে লাগলেন।

মহারাজ নন্দকুমার দেখলেন, কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা এদেশে যে রকম অত্যাচার করছে, তা' আর সহ্য করা যায় না; অথচ এ অত্যাচার দমন করাও সহজ নয়। এদেশের ইংরেজেরা প্রায় সকলেই ঘোর স্বার্থপর, স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সাহায্য করছে; সুতরাং, তাদের অত্যাচারের একটা প্রতিকার করতে হ'লে এদেশের ইংরেজদের দ্বারা হবে না। বিলাতের ইংরেজরা এদের মত স্বার্থপর বা ঘুসখোর নয়, তাদের কাছে সমস্ত কথা জানাতে পারলে একটা উপায় হ'তে পারে।

এই মনে ক'রে মহারাজ নন্দকুমার বহু টাকা খরচ ক'রে তাঁর পক্ষের একজন লোক রাখলেন, তিনি মহারাজের উপদেশ মত এদেশের ইংরেজ কর্ম্মচারীদের সমস্ত গুপ্ত কথা সেখানে ব্যক্ত করতে লাগলেন। সেই সূত্রে নন্দকুমারের সঙ্গে হেষ্টিংসের শত্রুতা দিন দিন বাড়তে লাগলো।

বারো

এসময় ইংরেজদের কলকাতার বোর্ডে তিনজন ন্যায়পরায়ণ ইংরেজ সভ্য এসেছিলেন। এঁদের ইচ্ছা ছিল, ইংরেজদের

নামে এদেশে যে সব কলঙ্কের কথা রটেছে, তা' দূর ক'রে দিয়ে কুঠীর কর্ম্মচারীদের ঘুস এবং অন্যান্য অত্যাচার বন্ধ ক'রে দেবেন।

মহারাজ নন্দকুমার তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের এই সবচেয়ে বড় সুযোগ মনে ক'রে একটি দরখাস্তে হেষ্টিংসের দোষগুলি লিপিবদ্ধ ক'রে বোর্ডের সভায় তা' দাখিল করলেন, (১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ, ১১ই মার্চ্চ)।

নন্দকুমার হেষ্টিংস-এর বিরুদ্ধে যে দরখাস্ত ক'রেছিলেন তার সারমর্ম্ম এই :—

১। "গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের উৎকোচ লওয়া ও অন্যান্য অন্যায় ব্যবহারের কথা আমি আজ বোর্ডের নিকটে প্রকাশ করছি। আমি এই সকল বিষয়ই জানতাম এবং বহু বিষয়ের সঙ্গে আমি সংশ্লিষ্টও ছিলাম, এই জন্য সভ্য মহাশয়েরা আমার অভিযোগ-পত্র পাঠ ক'রে আমাকেও দোষী ব'লে মনে করবেন। কিন্তু এসব গোপনে রাখলে আমার পক্ষে আরও ঘোরতর অন্যায় এবং পাপ হবে বিবেচনায় আমি এসব প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছি। হেষ্টিংস্ বাংলার গভর্ণর জেনারেল, সর্ব্বময় শাসনকর্ত্তা, এইজন্য আমাকে বিপদে প'ড়ে বিবেকের বিরুদ্ধে তার অন্যায় কাজে সাহায্য করতে হয়েছে।

২। "বাংলার গভর্ণর হয়ে হেষ্টিংস্ আমাকে বলেন যে,

মহম্মদ রেজাখাঁ ও সিতাব রায়, কোম্পানীর রাজস্ব বহুপরিমাণে আত্মস্মাৎ করছে। তাদের পদচ্যুত করে তিনি আমাকে নায়েব-সুবাদারের পদ প্রদানের প্রস্তাব করেন। আমি তাঁর অনুরোধে মহম্মদ রেজার্খার প্রদত্ত হিসাব পরীক্ষা করেছি।

সমস্ত কাগজ-পত্র পরীক্ষা করে যখন প্রমাণ পাওয়া গেল যে, রেজাখাঁ প্রায় তিন কোটি টাকা অপহরণ করেছে, তখন সে আর উপায় না দেখে আমাকে দুই লক্ষ টাকা এবং হেষ্টিংসকে এগারো লক্ষ টাকা ঘুস দেওয়ার প্রস্তাব করে। আমি সে কথা হেষ্টিংসকে জানালে তিনি তখন তাতে সম্মত হন নি। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি রেজার্খাকে মুক্তি দেন, এতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, তিনি রেজাখাঁর নিকট থেকে খুব মোটা টাকা ঘুস খেয়ে তাকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

৩। "খুব বেশী লাভের আশায় বিগত ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় মহম্মদ রেজাখাঁ বহু ধান কিনে গোলাজাত করে রেখেছিল।

৪। "দানশীলা নাটোরের রাণী ভবানীর কোনও প্রকার ত্রুটি বা অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও হেষ্টিংস্ কেবল স্বীয় প্রিয় বেনিয়ান কান্ত পোদ্দারের পুত্র লোকনাথ নন্দীকে হাতে রাখ-বার জন্য রাণীর বাহেরবন্দ পরগণার বিস্তৃত জমিদারী কেড়ে নিয়ে লোকনাথকে দিয়েছেন।

৫। "আমার পুত্র মহারাজ গুরুদাসকে নায়েব-সুবাদারের পদে এবং মীরজাফরের বেগম মণিবেগমকে নবাবের অভি-

ভাবিকা নিযুক্ত করার সময় হেষ্টিংস্ বহু টাকা ঘুস নিয়েছেন। আমি আমার গোমস্তা চৈতন্যনাথ এবং হেষ্টিংসের ভৃত্য জগন্নাথ, বালকৃষ্ণ এবং বেনিয়ান কান্ত পোদ্দারের মারফতে হেষ্টিংসকে তিনি থ'লে মোহর পাঠিয়ে দেই। প্রথম থ'লেতে ১৪৭১টি, দ্বিতীয় থ'লেতে ১৪৭১টি এবং তৃতীয় থ'লেতে ৯৮০টি মোহর ও ৫৭০টি আধুলি ছিল। দ্বিতীয় দফায় পুনরায় হেষ্টিংসকে ১৪৭০টি মোহর দেওয়া হয়।

৬। "হেষ্টিংস্ মুর্শিদাবাদে গিয়ে নবাব মোবারক-উদ্দৌলার গর্ভধারিণীকে অভিভাবিকার পদ থেকে বিচ্যুত করে বিমাতা মণিবেগমকে সেই স্থলে অভিভাবিকা এবং নবাব-ভবনের সর্ব্বময়ী কর্ত্রীর পদ প্রদান করেন। এই ব্যাপারে তিনি তখন এক লক্ষ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেন, দেড় লক্ষ টাকা বাকী থাকে, হেষ্টিংস্ কলকাতায় ফিরে গেলে মণিবেগম মহারাজ গুরুদাসকে দিয়ে আমার নিকট জিজ্ঞাসা করে পাঠান যে, গভর্ণর সাহেবের প্রাপ্য দেড় লক্ষ টাকা কি করে তাঁকে পাঠান হবে? আমি নিজে গিয়ে হেষ্টিংসকে সে কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, কাশিমবাজারের কান্ত পোদ্দারের ভাই নূরসিং-এর কাছে যেন ঐ টাকা দেওয়া হয়। পরে আমি আমার পুত্র মহারাজ গুরুদাসের পত্রে জানতে পারি যে, ঐ টাকা নূরসিংএর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৭। "দিল্লীর বাদশা আমাকে একখানা খুব দামী পাল্কী

পুরস্কার দিয়েছিলেন। সেই পাল্কী পাটনা পর্য্যন্ত এসে পৌঁছুলে সিতাব রায় তা' আটক করে। এই জন্য আমি হেষ্টিংসএর কাছে নালিশ করি। তিনি ঐ পাল্কী পাটনা থেকে আনিয়ে নিজে রেখে দিয়েছেন, আজ পর্য্যন্ত আমি তা পাই নি।

৮। "হেষ্টিংসএর কুকীর্ত্তির কথা আমি সমস্তই জানি, বোর্ডের কাছে ও সর্ব্বসাধারণের কাছে তা' প্রকাশ ক'রে দিয়ে আমি তার ঘোর অনিষ্ট করতে পারি, এই আশঙ্কায় হেষ্টিংস্ সর্ব্বদাই আমার ধ্বংসের চেষ্টায় আছে। মোহন প্রসাদ আমার পরম শত্রু, সে অতি নীচ এবং জঘন্য স্বভাবের লোক, কিন্তু হেষ্টিংসের সে একজন অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু। স্বার্থ-সাধনের জন্য তিনি তাকে অতি সমাদের সর্ব্বদাই নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে থাকেন। বাংলার গভর্ণরের মত একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পক্ষে মোহন প্রসাদের ন্যায় নীচ লোকের সঙ্গে ওরকম ঘনিষ্টতা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং সন্দেহজনক।"

সে সময়ে বোর্ডে ফ্রান্সিস, ক্লেভারিং ও মন্‌সন্ নামে তিন জন খুব ন্যায়পরায়ণ ইংরেজ সভ্য ছিলেন। বোর্ডের অন্যান্য সভ্যদের মধ্যে হেষ্টিংসের বন্ধুও অনেক ছিল। প্রকাশ্য বিচার সভায় মহারাজ নন্দকুমারের দরখাস্ত পড়া হলো। দেশময় হেষ্টিংশের কলঙ্কের কথা ছড়িয়ে পড়লো। বোর্ডের সভ্যদের মধ্যে অধিকাংশই হেষ্টিংসের বন্ধু, তারা হেষ্টিংসের মান বাঁচাবার

জন্য উঠে পড়ে লাগলো। কয়েক দিন ধরে সভায় তুমুল আন্দোলন এবং আলোচনার পর সেই তিনজন 'ন্যায়বান্ সভ্য হেষ্টিংসকে দোষী বলে সাব্যস্ত করলেন,—হেষ্টিংস্ এ পর্য্যন্ত কোম্পানীর যত টাকা আত্মসাৎ করেছেন সমস্তই তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু হেষ্টিংস সেই সভায় দাঁড়িয়েই বললেন,—তিনি ভারতে ইংরেজ কোম্পানীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী, সুতরাং তিনি বোর্ডের বিচার মেনে নিতে বাধ্য নন।

তেরো

এই ব্যাপার নিয়ে দেশে একটা মহা হৈ চৈ পড়ে গেল; হেষ্টিংস সকলের কাছে খুব অপদস্ত ও অপমানিত হলেন। তাঁর নানা কুকীর্ত্তি প্রকাশিত হয়ে পড়ায় তিনি অনেকের কাছেই ঘৃণার পাত্র হ'য়ে পড়লেন। মহারাজ নন্দকুমারের জন্যই তাঁর এই অপমান, সুতরাং তাঁর সর্ব্বনাশ সাধন করাই এখন হেষ্টিংসের সবচেয়ে বড় কাজ হয়ে দাঁড়ালো। তিনি নন্দকুমারের দোষ খুঁজতে আরম্ভ করলেন।

কামালউদ্দিন আলিখাঁ হিজলী পরগণার লবণের মহালের ইজারাদার এবং হেষ্টিংসের পরম অনুগত ব্যক্তি। হেষ্টিংস্ চক্রান্ত করে তাকে দিয়ে মহারাজ নন্দকুমার, তাঁর জামাতা রাধাচরণ রায়, জোসেফ্ ফাউক এবং ফ্রান্সিস্ ফাউকের নামে

সুপ্রিম কোর্টে এক নালিশ দায়ের করালেন। কিন্তু সে অভি-যোগে বিশেষ ফল হবে না দেখে হেষ্টিংস্ তাঁর বন্ধু সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের পরামর্শ মত নন্দকুমারকে অপর একটি অভিযোগে অভিযুক্ত করবার জন্য চক্রান্ত করতে লাগলেন; বহুদিন পূর্ব্বে মহারাজ নন্দকুমারের নামে একটা মিথ্যা জাল মোকদ্দমা হয়েছিল, তা'তে নন্দকুমারের সাজা হয় নি। এবার আবার সেই পুরানো জাল মোকদ্দমাটা নূতন করে গড়ে তুলবার আয়োজন চলতে লাগলো।

এখানে সেই জাল মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলা আবশ্যক। অনেক দিন আগেকার কথা, নবাব মীরকাশিম তখন বাংলার মসনদে। সে সময় মহারাজ নন্দকুমার বুলাকী-দাস নামে একজন শেঠের কাছে কিছু হীরাজহরতের অলঙ্কার বিক্রী করতে দিয়েছিলেন। তার দাম প্রায় ৫০ হাজার টাকা। মীরকাশিমের সঙ্গে যখন ইংরেজদের যুদ্ধ হয়, তখন বুলাকীদাস মীরকাশিমের দলের লোক বলে তাঁর কুঠীও লুণ্ঠিত হয়, বুলাকী-দাসের সমস্ত সম্পত্তির সঙ্গে নন্দকুমারের অলঙ্কারগুলিও লুঠ হয়ে যায়। বুলাকীদাস ছিল খুব ধর্ম্মভীরু লোক, সে নন্দ-কুমারকে টাকা দিতে না পারায় একখানা দলিল লিখে দেয়। সেই দলিলে লেখা ছিল, কোম্পানীর কাছে বুলাকীদাসের প্রায় দুই লক্ষ টাকা পাওনা আছে, সেই টাকা আদায় হলে সে মহারাজকে তাঁর সমস্ত পাওনা শোধ করে দেবে। কিন্তু বুলাকী-

দাস বেঁচে থাকতে কোম্পানীর কাছ থেকে সে টাকা আদায় হয়নি। বুলাকীর মৃত্যুর পর কোম্পানীর কাছ থেকে নন্দকুমার অনেক চেষ্টায় সেই দুই লক্ষ টাকা আদায় করে বুলাকীদাসের স্ত্রীকে দেন। বুলাকীর স্ত্রী সেই টাকা পেয়ে মহারাজের প্রাপ্য টাকাও শোধ করে দিয়েছিলেন। টাকা আদায় হয়ে গেলে নন্দকুমার বুলাকীদাসের প্রদত্ত সেই দলিলখানা তার উত্তরাধিকারীদের হাতে ফিরিয়ে দেন।

তারপরেও অনেকদিন চলে গেল। বুলাকীদাসের স্ত্রীর মৃত্যু হলো। এ পর্য্যন্ত সেই দলিল সম্বন্ধে কোনো কথাই উঠলো না। পূর্ব্বে হেষ্টিংসের অনুরক্ত যে মোহন প্রসাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, এই সময়ে সে বুলাকীদাসের জ্ঞাতিগণের মোক্তার ছিল। সেই লোকটি জ্ঞাতিদের পরামর্শ দিল যে, নন্দকুমার যে দলিলখানা ফিরিয়ে দিয়েছেন, তা' জাল ; সেটা বুলাকীদাসের লেখা নয়, বুলাকীদাস কখনো ও-রকম দলিল নন্দকুমারকে দেননি। এখন মামলা করলে দলিল যে জাল তা' সহজেই প্রমাণ হবে এবং তা' হলে নন্দকুমারের কাছ থেকে সেই টাকাগুলো আদায় করে নেওয়া যেতে পারে। মোক্তারের কথায় তারা সব নেচে উঠলো, অতগুলো টাকার লোভ সামলাতে পারলো না। আদালতে মহারাজ নন্দকুমারের নামে জাল দলিলের মামলা আরম্ভ হলো।

পক নামে একজন বড্ড বদ্‌মেজাজী জজের উপর এই

মোকদ্দমার বিচারের ভার পড়েছিল। তিনি মোকদ্দমার বিচার না করেই আগে মহারাজ নন্দকুমারকে কারাগারে পাঠালেন। সে সময় আবার মোহম্মদ রেজা খাঁর নামে একটা মোকদ্দমা চলছিল ; সে ইংরেজ কোম্পানীর বহু টাকা আত্মসাৎ করেছিল বলে ইংরেজরা তার নামে নালিশ করেছিল। মহারাজ নন্দকুমারের সাহায্য না পেলে এ মোকদ্দমা হতে পারে না দেখে ওয়ারেণ হেষ্টিংস স্বয়ং মধ্যস্থ হয়ে নন্দকুমারের নামে জাল মোকদ্দমা মিটমাট করে দিলেন ; মহারাজ কারাগার থেকে অব্যাহতি পেলেন।

চৌদ্দ

এই ঘটনার অনেক দিন পরে যখন মহারাজ নন্দকুমার হেষ্টিংসের নামে বোর্ডের কাছে নালিশ করে তাকে যারপর নাই অপদস্থ ও অপমানিত করলেন, তখন হেষ্টিংস্ সেই রাগে মহারাজকে আবার ফাঁদে ফেলবার জন্য মোহনপ্রসাদকে দিয়ে সেই পুরানো মোকদ্দমাটা আদালতে রুজু করে দিলেন। বিলাতের আইনে তখন জাল অপরাধে ফাঁসী হতো। হেষ্টিংস্ দেখলেন, যদি নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জাল অপরাধ প্রমাণ করা যায় তবে নিশ্চয়ই তাঁর ফাঁসী হবে। নন্দকুমারকে সরাতে

পারলে বাংলাদেশে আর এমন কেহ লোক নাই, যে হেষ্টিংস-এর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে। সোজা কথায় বলতে গেলে আত্মরক্ষার জন্যই হেষ্টিংস্ নন্দকুমারের নামে জাল মোকদ্দমার সৃষ্টি করেছিলেন।

যখন সুপ্রীম কোর্টে নন্দকুমারের নামে কামালউদ্দিন আলি খাঁর উপস্থাপিত মামলার বিচার চলছিল, তখন হেষ্টিংস্ দেখলেন, সে মামলায় নন্দকুমারকে ফাঁদে ফেলবার সুবিধে হবে না। তখন তিনি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পরম বন্ধু ইলাইজা ইম্পেকে গিয়ে ধরলেন, ভাই, এ বিপদে যদি তুমি বন্ধুকে রক্ষা না কর তবে মান-ইজ্জৎ সব যায়। ইম্পে বন্ধুর মান ইজ্জৎ বজায় রাখবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। তাঁরই পরামর্শে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে আবার নূতন করে জাল মোকদ্দমার পত্তন হ'লো।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে, রাত্রি ১০টা। কেউ কিছু জানে না, হঠাৎ মহারাজ নন্দকুমার গ্রেপ্তার হয়ে ইংরেজের কারাগারে প্রেরিত হলেন। সমস্ত শহরে সেই রাত্রেই এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো; যে শুনলো, তারই বিস্ময়ের অবধি রইলো না, মহারাজ নন্দকুমারের মত একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ এমন কি কুকার্য্য করতে পারেন যার জন্যে রাত্রেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার আবশ্যকতা হলো? গ্রেপ্তারের কারণ সকলের নিকটই অজ্ঞাত রয়ে গেল। নন্দকুমারকে জামিনে পর্য্যন্ত মুক্তি দেওয়া

হলো না। সেই রাত্রেই তিনি কারাগারে প্রেরিত হলেন। এ ব্যাপরও লোককে আরও বিস্ময়াবিষ্ট ও সন্ত্রস্ত করে তুললো।

পরে জানা গেল যে, মোহনপ্রসাদ নামক মহারাজ নন্দকুমারের ভীষণ শত্রু এবং হেষ্টিংসের পরম অনুগৃহীত এক ব্যক্তি মহারাজের নামে জাল দলিল প্রস্তুতের অপরাধে অভিযোগ আনয়ন করেছে, তারই ফলস্বরূপ এই গ্রেপ্তার।

এই ঘোর চক্রান্তের মূলে ছিলেন, হেষ্টিংস্, বোর্ডের জনৈক সভ্য বারওয়েল ও ভান্সিটার্ট, রাজা রাজবল্লভ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, কান্ত পোদ্দার প্রভৃতি। হেষ্টিংসই এর মূল কর্ণধার, নন্দকুমারকে সমূলে ধ্বংস করাই তার প্রধান উদ্দেশ্য।

মহারাজ নন্দকুমার ছিলেন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। কারাগারে তিনি কিছুই আহার করতে রাজি হলেন না। তিন চার দিন তাঁর অনাহারেই কেটে গেল। অবশেষে তিনি স্বতন্ত্র আহারের ব্যবস্থার নিমিত্ত সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের নিকট আবেদন করলেন। বিচারপতিগণ অবশেষে অনেক ভেবে চিন্তে মহারাজের স্বতন্ত্র আহারের ব্যবস্থা করে দিলেন। ১১ই মে সেই নূতন ব্যবস্থা অনুসারে তিনি পূজাহ্নিক সেরে জলগ্রহণ করলেন।

নন্দকুমারের এই অভাবনীয় ব্যাপারে দেশের লোক হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিল। প্রত্যহ শত শত লোক কারাগারে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের সমবেদনা জানাতে লাগলো।

পনেরো

৮ই জুন তারিখে সুপ্রীম কোর্টে মহারাজ নন্দকুমারের প্রকৃত বিচার আরম্ভ হলো। প্রধান বিচারক হলেন হেষ্টিংসের ছোটবেলার বন্ধু ইম্পেসাহেব।

নন্দকুমারের বিরুদ্ধে যে সব সাক্ষী যোগাড় করা হয়েছিল, তারা সকলেই হেষ্টিংসের পক্ষের লোক। অনেকেই গুণ্ডা ও বদমায়েস দলের। বিচারের সময় যে বারো জন জুরী ছিল, তারা সকলেই সাহেব, এদেশের লোক তাদের মধ্যে একজনও ছিল না। বিচার আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই আদালতে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল।

১৬ই জুন পর্য্যন্ত বিচার চলেছিল। বিচারের সময় ফরিয়াদী পক্ষকে যতটুকু সুবিধা দেওয়া হয়েছিল আসামী পক্ষকে তা' কিছুই দেওয়া হয় নি। মহারাজ নন্দকুমারের পক্ষের উকীল ফ্যারার সাহেব মোকদ্দমা মিথ্যা প্রমাণ করতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, প্রকৃতপক্ষে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণই পাওয়া যায় নাই। তথাপি হেষ্টিংসের বন্ধু বিচারকগণ তাঁকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হলেন। নন্দকুমারকে যে করেই হোক শাস্তি দিতে হবে, তা' ইম্পেসাহেব গোড়া থেকেই ঠিক করে রেখিছিলেন। তাই নন্দকুমারকে তার পক্ষের কথা ভাল করে বুঝিয়ে বলতে সুবিধা দেওয়া হয় নি। ইম্পেসাহেব এমন করে জুরীদের নন্দকুমারের অপরাধের কথা

বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁর কথার ভাবভঙ্গীতে তারা সবাই সাব্যস্ত করে নিল যে, নন্দকুমারকে জাল অপরাধে দোষী বলে ঘোষণা করতেই হবে।

ইম্পেসাহেব যখন জুরীদের মতামত জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তারা সবাই একবাক্যে মহারাজকে জাল অপরাধে অপরাধী বলে ঘোষণা করলো। জুরীরা অপরাধী বলেছে, আর যায় কোথা? ইম্পেসাহেব তৎক্ষণাৎ বিলাতের আইন অনুসারে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন। রায় পর্য্যন্ত লেখা হলো না, মুখে মুখেই ফাঁসীর হুকুম হয়ে গেল।

মহারাজ স্থির ধীর হয়ে তাঁর মৃত্যুর আদেশ শুনলেন, তাঁর প্রশান্ত মুখে বিন্দুমাত্র ভয় বা বিষাদের চিহ্ন দেখা গেল না। তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা হাহাকার করে উঠলো, দর্শকদিগের মধ্যে সকলেরই চোখ জলে ভরে গেল। কেবল আনন্দিত হলো হেষ্টিংসের দল। এমনকি, হেষ্টিংসের দলের কোনও কোনও পাপিষ্ঠ বাঙ্গালী-কুল-কলঙ্ক এত আনন্দিত হয়েছিল যে, তারা ইম্পেসাহেবকে তার ন্যায় বিচারের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে এক অভিনন্দন-পত্র পর্য্যন্ত দিয়েছিল। তা'তে তারা লিখেছিল,—'হে প্রভু, ইংলণ্ডের আইন অনুসারে সুপ্রীম কোর্ট কলকাতার অধিবাসীদের বিচার করবেন শুনে আমরা প্রথমে বড়ই ভীত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু মহারাজ নন্দকুমারের মোকদ্দমায় যে রকম সুবিচার হয়েছে তা'তে আমাদের সে ভয় দূর হয়ে গেছে।

এই ন্যায় বিচারের জন্য আমরা কলিকাতাবাসী প্রধান বিচার-পতি ও অপর তিনজন বিচারকের নিকট অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।' এই অভিনন্দন ব্যাপারের উদ্যোক্তা ছিলেন স্বয়ং হেষ্টিংস্ ও তার বন্ধু বারওয়েল সাহেব। তাদের পরামর্শে এবং কান্ত পোদ্দার, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও রাজা নবকৃষ্ণ দেবের নেতৃত্বে অভিনন্দন-পত্র প্রস্তুত হলো; চল্লিশজন লোক তাতে স্বাক্ষর করলো। এই চল্লিশজনের মধ্যে ছিল, নন্দকুমারের বিচারের জুরীগণ, হেষ্টিংস্ ও বারওয়েলের ইংরাজ-বন্ধু ও খানসামার দল, লালবাজারের কয়েকজন জুতাওয়ালা, কান্ত পোদ্দার, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এবং রাজা নবকৃষ্ণ দেব। নবকৃষ্ণ ছিলেন একজন অতি জঘন্য চরিত্রের লোক, তার বহু কুকীর্ত্তির কথা নন্দকুমার জানতেন এবং কয়েকবার তিনি নব-কৃষ্ণের নামে অভিযোগও করেছিলেন, তাই নন্দকুমারের উপর তার এই প্রতিহিংসা সাধন।

ষোল

ফাঁসীর হুকুম হওয়ার পর আবার মহারাজকে জেলে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে একটা দু'তলা ঘরে তাঁকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘরেই তিনি পূজা-আহ্নিক জপ-তপ

ক'রে কাটাতেন। কখনো তাঁহাকে একটু বিমর্ষ, দুঃখিত বা চিন্তিত দেখা যেতো না। ফাঁসীর হুকুম হওয়ার পর যে ক'দিন তিনি পৃথিবীতে ছিলেন, সে ক'দিন বহু লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতো, তিনি সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কথাবার্ত্তা বলতেন। দুদিন পরেই তাঁকে ফাঁসী কাঠে ঝুলতে হবে, এ ভাবনা যেন তাঁর মোটেই ছিল না।

বিচারকেরা এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে দিলেন না। নন্দকুমারের উকীল ফ্যারার সাহেব অবশেষে মহারাজের নামে প্রাণ ভিক্ষার জন্য দরখাস্ত করলেন, কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের ন্যায়বান্ বিচরকেরা তা অগ্রাহ্য করিলেন।

বিচারকদের ইচ্ছা ছিল, জুলাই মাসের মধ্যেই ফাঁসী হয়ে যায়। কিন্তু নানা কারণে তা হয়ে উঠলো না। ফাঁসীর দিন স্থির হলো ৫ই আগষ্ট।

৪ঠা আগষ্ট সন্ধ্যায় মহারাজ আহ্নিকাদি শেষ করে বিষয়-কার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে পুত্র রাজা গুরুদাসকে একখানা পত্র লিখে রাখলেন এবং অনেক হিসাবপত্র পরীক্ষা করলেন; তারপর শয়ন করতে গেলেন। ঘুমের কোনও ব্যাঘাত হ'লো না। ভোরে উঠেই জপ-তপ নিয়ে বসলেন।

৫ই আগষ্ট প্রভাতে তাঁকে পাল্কীতে করে ফাঁসীর যায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি সানন্দে হরিনাম করতে করতে গিয়ে পাল্কীতে উঠলেন। খিদিরপুরের পুলের পূর্ব্বদিকে যে

স্থানটা কুলির বাজার নামে পরিচিত, সেখানেই ফাঁসী-মঞ্চ তৈরী হয়েছিল।

ভোর থেকেই ফাঁসী-মঞ্চের কাছে লোক জমতে আরম্ভ হয়েছিল। দেখতে দেখতে চারিদিকে হাজার হাজার লোক সমবেত হলো—যেন নরমুণ্ডের কালো সমুদ্র। সকলেরই মুখ বিষাদমাখা, সকলের মুখে হাহাকার। মহারাজ একবার পাল্কী থেকে মুখ বাড়িয়ে ফাঁসী-মঞ্চ এবং জনসমুদ্র দেখে নিলেন। তাঁর মুখ-ভাবের একটুও পরিবর্ত্তন হলো না। পাল্কী দেখে লোকেরা আরও হাহাকার করে উঠলো। ফাঁসীর যায়গায় গিয়ে নন্দকুমার পুত্র গুরুদাস এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বল্লেন।

নন্দকুমারের ইচ্ছা অনুসারের তাঁর শবদেহ বয়ে নেওয়ার জন্য কয়েকজন ব্রাহ্মণ যোগাড় করা হয়েছিল। তারা নির্দ্দিষ্ট সময়েই ফাঁসী-মঞ্চের কাছে উপস্থিত ছিল।

ফাঁসীর সময় হলো। প্রশান্ত বদনে স্থির চিত্তে ইষ্টনাম জপ করতে করতে তিনি মাচার উপরে গিয়ে উঠলেন। তার ইচ্ছা অনুসারেই সেই ব্রাহ্মণেরা তাঁর হাত বেঁধে দিল। দর্শকদের প্রাণ দুরু দুরু করে কেঁপে উঠ্‌লো। মহারাজ ফাঁসীমঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে জীবনের শেষ একবার চারিদিকে তাকিয়ে তার শ্যামা জন্মভূমি পৃথিবীর শোভা দেখে নিলেন ; মূহূর্ত্ত পরেই তাঁকে এ জগৎ থেকে চিরবিদায় নিতে হবে। তখনো তাঁর মুখে উদ্বেগের

কোনো চিহ্ন নাই, নির্ভীক ব্রাহ্মণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর তাঁর মুখ একখান্না কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো।

তখনো দর্শকদের মনে বিশ্বাস হ'লো যে ব্রাহ্মণকে কিছুতেই ফাঁসী দেওয়া হবে না, শুধু ভয় দেখানো হচ্ছে মাত্র। কিন্তু মূহূর্ত্ত পরেই যখন সত্যি সত্যি তাদের চেখের উপর ব্রহ্মহত্যা হয়ে গেল, যখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মৃতদেহ তাদের চোখে সম্মুখে ফাঁসী-কাষ্ঠের সঙ্গে ঝুলতে লাগলো, তখন জনসমুদ্রের মধ্যে যেন একটা তীব্র উত্তেজনা এবং উন্মত্ততার ভাব জেগে উঠলো। "ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল," "কলকাতা অপবিত্র হলো," "বাংলাদেশ পাপে ডুবলো" ইত্যাদি আর্ত্তনাদ করতে করতে লোকেরা চারিদিকে ছুটে পালাতে লাগলো। কেউ আর তিলমাত্র সেখানে দাঁড়ালো না। ব্রহ্মহত্যা দর্শন পাপ, এই জন্য অনেকে গঙ্গায় স্নান করে বাড়ী ফিরলো। অনেক নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ব্রহ্মহত্যার স্থান কোম্পানীর রাজ্য কলকাতা ছেড়ে অন্যত্র বাস করতে লাগলো। ঐ দিনে কলকাতা শহরে ব্রাহ্মণেরা অন্নজল গ্রহণ করেন নি। সেই দিন থেকে অনেকদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণেরা কোনো কাজে কলকাতায় এলে যতক্ষণ কলকাতায়,—ব্রহ্মহত্যার পাপ-স্থানে —থাকতেন, ততক্ষণ জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করতেন না।

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী সম্বন্ধে একটা জনরব আছে, তিনি নাকি ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন যে, ব্রাহ্মণ দিয়ে যেন তাঁর গলায় ফাঁসীর দড়ি পরানো হয়। কোনো ব্রাহ্মণ এতে রাজী

হয় নি। অবশেষে বরাহনগর-নিবাসী জনৈক লোভী ব্রাহ্মণ বহু টাকার লোভে এই জঘন্য কাজ ক'রেছিল। এতে এ অঞ্চলের অনেক ব্রাহ্মণ আর এ পাপ দেশে বাস করবেন না বলে বালী, উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্থানে চ'লে গেলেন। সেই থেকে নাকি বরাহনগরে ব্রাহ্মণের সংখ্যা কম হলো, আর বালী উত্তর-পাড়া অঞ্চলে বেড়ে গেল।

মোটের উপর মহারাজ নন্দকুমারের এই শোচনীয় পরিণামে সমস্ত দেশে একটা আতঙ্ক এবং শোকের সৃষ্টি হয়েছিল। নন্দকুমারের ফাঁসীই ইংরেজ রাজত্বে প্রথম ব্রহ্মহত্যা। তখন সকলের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, যারা রাজ্যস্থাপনের সময়েই ব্রহ্মহত্যা করতে পারে, তারা না করতে পারে এমন কাজ নেই।

হায়, যে নন্দকুমারের কাছে ইংরেজরা বহু উপকারে উপকৃত, যিনি পরোক্ষভাবে বাংলা দেশে ইংরেজ-শাসন প্রতিষ্ঠার একজন প্রধান সহায় ছিলেন, যিনি একদিন ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজদের মান বাঁচিয়েছিলেন, তা না হলে বাংলা দেশে ইংরেজদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হতো না, সেই উপকারী ব্যক্তিকে একজন মাত্র ইংরেজের সম্মান ও স্বার্থ বাঁচাবার জন্য ফাঁসী-কাঠে ঝুলিয়ে তাঁর উপকারের প্রতিদান দেওয়া হলো!

ইংরেজদের মধ্যে সকলেই ওয়ারেণ হেষ্টিংস্, ইম্পে বা বার-ওয়েলের মত পাপিষ্ঠ নন। তাঁদের মধ্যেও বহু ন্যায়বান্

ধার্ম্মিক লোক আছেন। হেষ্টিংস্ এবং ইম্পের এই কুকীর্ত্তি বিলাতের লোকেরা শুনে ঘৃণায় ছি ছি করতে লাগলো। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় তাদের দুজনের নামে অন্যায় রকমে নন্দকুমারের হত্যার অভিযোগ আনা হ'লো। বার্ক, সেরিডন প্রভৃতি বক্তারা বিচারসভায় তাদের যারপরনাই অপদস্থ ও অপমানিত করতে লাগলেন। বিচার দেখবার জন্য সভায় এত লোকের ভিড় হয়েছিল যে, এক-একখানি টিকিট নাকি ৫০০ টাকা মূল্যে পর্য্যন্ত বিক্রী হয়েছিল। সাত বছর ধরে এই বিচার চলেছিল। হেষ্টিংস্ ও ইম্পে বহু টাকা খরচ ও বহু অপমান ভোগ করে শেষে অতিকষ্টে অব্যাহতি পেয়েছিলেন। তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্টই হয়েছিল। লর্ডসভা এদের নির্দ্দোষ বলে ঘোষণা করলেও কমন্স সভা সে মত সমর্থন করেন নি।

—শেষ—